জীবনের সেই সব নিভৃত কুহক : পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প

বরেন্দু মণ্ডল

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প বা গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে আমরা কোনো পাঠ-প্রস্তাবনা রচনা করতে চাইছি না। পীযূষের আখ্যান ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়ে গেছে ওঁর একান্ত নিজস্ব যে ভাবজগৎ, একজন গুণী-রূপদক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিসরের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রখর সময় সচেতনতা অথবা সময়কে অস্তিত্বহীন করে দেওয়া, গল্পের ভূমির উপর দাঁড়িয়েও সৃষ্টি করে তোলা কবিতার যত আলো আর আলোড়ন— আমরা চাইছি সেই সব কিছুকে স্পর্শ করতে, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে।

কৃন্তন কবিতাপত্র থেকে *মধুপর্ণী*, 'মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা' থেকে 'গরম ভাত', কবি থেকে গদ্যকার 'কুশপুত্তলিকা গল্প' থেকে 'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ' বালুরঘাট থেকে সীমানার দুপারের বাংলাদেশ— এর মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে দীর্ঘ তিন দশক ব্যাপ্ত পীযূষ ভট্টচার্যের সাহিত্যজীবন। পীযূষ ভট্টাচার্যের জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে। শৈশব কেটেছে বালুরঘাটে, কলকাতার চিৎপুরে, কখনো বা অধুনা বাংলাদেশের রংপুরে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ পর্বে উৎসাহী তরুণ বন্ধুরা মিলে প্রকাশ করলেন কৃন্তন। সেখানেই কবি হিসেবে পীযূষের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ষাটের দশকের শেষপর্ব— *কৃন্তন*— *কৃন্তন-মধুপর্ণী*-র মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব— বালুরঘাট, ওই সময়টা যাঁরা একসঙ্গে যাপন করছেন পীযূষের সেই বন্ধু, সহযাত্রী, প্রাবন্ধিক অজিতেশ ভট্টাচার্যের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে এখানে স্মরণ করছি— পীযূষের শুরুর শুরুটা বোঝার জন্যে :

> ছয়ের দশকের শেষ পর্বে, পীযুষ ভট্টাচার্য যখন তরুণ তুর্কি 'কৃন্তন' কবিতাপত্রকে সামনে রেখে 'মধুপর্ণী-র প্রতিস্পর্ধী হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা, পীযূষ তার স্বেচ্ছাসৈনিকদের একজন। ১৯৬৫-তে 'মধুপর্ণী' প্রকাশিত হবার পর শহরে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সংক্ষেপে 'এই পত্রিকা এলিটদের মুখপত্র, এখানে তরুণ প্রজন্মের কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেই'। অতএব 'কৃন্তন'। কিন্তু বালুরঘাটের মাটিতে যুদ্ধ যমে না।... প্রচুর আড্ডা এবং স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে দু-তিন বছর অনিয়মিত ভাবে 'কৃন্তন' বেরুবার পর ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। পরবর্তী সময়ে 'মধুপর্ণী'-র সমান্তরাল ভাবে আরও নতুন নতুন পত্রিকা বেরিয়েছে, তবে 'কৃন্তন'-এর পর এই ধারার সাড়া জাগানো পত্রিকার নাম 'প্রতিলিপি'।
>
> ('কাছের কথাকার' : অজিতেশ ভট্টাচার্য, *গল্পবিশ্ব*, আগস্ট ২০০৭)

এই *প্রতিলিপি*-তে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় পীযূষ ভট্টাচার্যের প্রথম গল্প 'গরম ভাত'। যদিও গল্পটি আজও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। ১৯৭৯ থেকে আজ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ২০১০) পীযূষ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি দেড়শোর অধিক কিছু গল্প। গল্প রচনার প্রথম দশক পেরিয়ে গেল— পীযূষের কোনো সংকলন গ্রন্থ পাঠকের কাছে পৌঁছোচ্ছে না। দ্বিতীয়

দশকও পেরিয়ে গেল—তবুও নয়। বোঝাই যাচ্ছে— চটজলদি সাফল্য, প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা-র নিরক্ষরেখার বাইরে থাকতে চাইছেন গল্পকার। এখানে এই তথ্যটাও মনে রাখতে হচ্ছে, ততদিনে বালুরঘাট ছাড়িয়ে কলকাতা, কাঁটা তারের নিষেধ তুচ্ছ করে পদ্মপারের বাংলার গুরুত্বপূর্ণ, মেধাবী প্রায় সব কাগজেই লিখছেন পীযূষ। তবু বই প্রকাশে দ্বিধা, এত অনীহা কেন? পীযূষ কী আরও ভাঙতে চাইছেন নিজেকে, আরও পরিশীলিত— ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে নয়, মার্কসীয় দর্শনকে বুঝতে চাইছেন নতুন করে। ইয়োরোপীয় সাহিত্য নয়, পড়তে চাইছেন লাতিন আমেরিকার সাহিত্য— আর সময়ের এই ক্রমপাঠ পেরিয়ে পীযূষ ক্রমশ ছাড়িয়ে যাচ্ছেন পীযূষকে। পীযূষের প্রথম গল্প সংকলন *কুশপুত্তলিকা* গল্প রক্তকরবী প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৫-এ। তারপর বিগত দেড় দশকের মধ্যে আমরা তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি আরও পাঁচটি গল্প সংকলন— *পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প* (রক্তকরবী, ১৯৯৮), *কীর্তিমুখ* (নয়া উদ্যোগ, ২০০১), *পদযাত্রায় একজন* (নয়া উদ্যোগ, ২০০৪), *নির্বাচিত গল্প* (দীপ প্রকাশন, ২০০৪), *ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প* (নয়া উদ্যোগ, ২০০৬) ও *শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ* (নয়া উদ্যোগ, ২০০৯)। এছাড়াও আমরা তার কাছ থেকে পেয়েছি— একটি উপন্যাসিকা *জীবিসঞ্চার* (রক্তকরবী, ২০০১) ও একটি উপন্যাস সহ গল্পসংকলন *নিরক্ষরেখার বাইরে* (প্রমা, ২০০২)।

'কুশপুত্তলিকা' থেকেই আমরা লক্ষ করছি পীযূষ গল্প বলার প্রচলিত পথে হাঁটলেন না। স্টোরি-টেলার কখন যে চরিত্র হয়ে উঠছেন, ফার্স্ট পার্সেন ন্যারেটর গল্পটাকে টানছেন— লেখক ইনডিভিজুয়াল। আবার পীযূষ কখন যে কথোপকথনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বা, আখ্যানের চরিত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে— সিকোয়েন্সকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তার জন্যে পাঠককে প্রস্তুত থাকতে হয়— বাক্য থেকে বাক্যে, প্রতিটি মুহূর্তে। বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনা দাবি করে।

প্রথম গল্প সংকলন থেকেই আমরা পীযূষের গল্পে ইমেজ ব্যবহারের দক্ষতার পাশাপাশি লক্ষ করছি প্রতীক ব্যবহারের নৈপুণ্য। মিথের ভাঙা গড়ার পাশাপাশি লোকশ্রুতির পুনর্নির্মাণ। 'ঠাকুমার তালপাখা' পেরিয়ে 'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ও তার মাদি মোষ'-এ পৌঁছে পাঠক পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের শৈলী বা প্রকরণগত অভিনবত্বের পাশাপাশি মুগ্ধ হয়ে যান তাঁর বিষয়ভাবনার অভিনবত্বে। ইমেজ, চিত্রকল্প, প্রতীক, মিথ, লোকশ্রুতি, লোককথা, লোক ইতিহাস, টোটেম, ট্যাবু— সর্বোপরি মেনস্ট্রিম ইতিহাসের পাশে লেখকের ইতিহাস কল্পনা, প্রত্নজ্ঞান ও রাজনৈতিক বীক্ষা পীযূষ ভট্টাচার্যের আখ্যানভুবনকে স্বাভাবিক ভাবেই করে তোলে বহুস্বরিক। আসুন প্রবেশ করি সেই বহুস্বরিক গল্পভুবনে।

কবিতার আলো অন্ধকার

আরও অনেকের মতো কবিতা দিয়েই পীযূষ ভট্টাচার্যও শুরু করেছিলেন তাঁর সাহিত্যজীবন— যদিও আখ্যানকার পরিচয়ের ব্যাপ্ততা পূর্ববর্তী পরিচয়কে ছাপিয়ে গেল অনেকখানি। দুটি পরিচয়ের মধ্যে আপাত বিরোধ নেই কোনো। কবিতা আর গদ্য দুটি পৃথক মাধ্যম, কবিতা

আর গল্প/উপন্যাস আলাদা সংরূপ, তেমনি কবি এবং গদ্যকার— পৃথক দুটি শিল্পীসত্তা। পৃথক পৃথক ভাবে নয়, পীযূষ দুটি শিল্পীসত্তাকে একই সঙ্গে লালন করেছেন। আর তাই পীযূষের গদ্যে পাই কবিতার অনুরণন। একটি সাক্ষাৎকারে পীযূষ নিজেই জানিয়েছেন :

> কবিতার একটা মাত্র বই বের হয়েছিল 'মহিন্ন অসুখ মহিন্ন যন্ত্রণা' — আগের লেখা কবিতা নিয়ে ১৯৯১-এ। ইদানীং সেই অর্থে কবিতা লিখি না। কেননা যেভাবে গদ্যটা লিখবার চেষ্টা করি তা কবিতাকেই স্পর্শ করে থাকে। আর এ হচ্ছে ভারতীয় বাঙালির ঐতিহ্যানুসারে কাব্য-গীতিময়তার গদ্য। ('কথাবার্তায় পীযূষ ভট্টাচার্য' : *গল্পবিশ্ব*, সম্পাদক : অলোক গোস্বামী, পঞ্চম সংখ্যা ২০০৭)

নতুন সহস্রাব্দীর যে দশক পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা— পীযূষের এই দশকের গদ্যে আমরা অনেক বেশি করে পাই পীযূষেরই বক্তব্যের শিল্পীত প্রকাশ। গদ্য সেখানে আসে কবিতার হাত ধরাধরি করে, কোথাও বা কবিতাই রচনা করে দেয় গদ্যের পটভূমি।

ঔপন্যাসিক পীযূষ ভট্টাচার্য আমাদের আলোচনার লক্ষ্য নয়— গল্পকার পীযূষ ভট্টাচার্যকে বিশ্লেষণ করা, তাঁর আখ্যান ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়াই এ প্রবন্ধের অভিপ্রায়। পীযূষের আখ্যানব্যক্তিত্ব, বিশেষত তাঁর গল্পের ফর্ম, স্টাইল, সর্বোপরি গল্পভাষার দিকে তাকালে— তাঁকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়দের সার্থক উত্তরসূরি মনে হয়। যদিও গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের গল্প পীযূষকে সেভাবে টানেনি। প্রিয় কবি হলেও গল্পকার জীবনানন্দ পীযূষকে অনুপ্রাণিত করেননি। অথচ ওঁর গল্পে নীরবতার ভাষা বা ভাষার নীরবতা— মনে হয় যেন গল্পকার জীবনানন্দ থেকে পাওয়া। ব্যক্তিগত সময়কে আখ্যান-সময়ে রূপান্তরিত করা, গদ্যের পরতে পরতে ছোটো ছোটো কাজ, ইমেজ সৃষ্টি কখনো কখনো প্রেমেন্দ্র মিত্র বা আরও পরের শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে করিয়ে দেয়। অথচ এঁদের লেখালেখির প্রত্যক্ষ প্রভাব কোথাও নেই পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে। অন্যদিকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী বা দেবেশ রায়— যাঁরা তাঁর প্রিয় কথাকার, সেই সব ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের লেখালেখি পীযূষকে অনুপ্রাণিত করেছে সবচেয়ে বেশি— অথবা পীযূষ ভট্টাচার্য কোথাও তাঁদের অক্ষম অনুকরণ করলেন না, অনুসরণও নয়।

নিজেকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে, প্রার্থিত একটি গল্পভাষাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে পীযূষ বারবার তাঁর গদ্যকে ভাঙছেন। সেই ভাঙা-গড়ার খেলা থেকে পীযূষ তাঁর গল্পভাষাকে আবিষ্কার করে নিলেন। বিগত শতাব্দীর আশি দশকের শুরুর দিক থেকে কবিতা-স্পন্দিত গদ্যকে পীযূষ তাঁর গল্পে ব্যবহার করলেন। নতুনতর ইমেজে, কবিতার ব্যঞ্জনায় নব্বইয়ের দশকে সেই ভাষা উঠল আরও পরিশীলিত হয়ে। ভারতীয় লোককথা ও বিভিন্ন জনজাতির লোকশ্রুতি, টোটেম ও ট্যাবু-র তত্ত্ব-তালাশ আর মিথ-পুরাণের ভাঙা-গড়া নিয়ে নতুন সহস্রাব্দীর চলমান দশকে পীযূষ ভট্টাচার্য যে সমস্ত গল্প লিখলেন, যে সব গল্পের জন্য মেধাবী পাঠক-সমালোচক তাঁর মৌলিকত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন— সেই সব

গল্পের মধ্যে রয়ে গেছে আশ্চর্য এক কাব্যিক সম্মোহন। কবিতার সেই সব আলো অন্ধকারের মধ্যে ছবির খোঁজে, চিত্রকল্পের খোঁজে পাঠক বেরিয়ে পড়তে পারেন এক ব্যক্তিগত ভ্রমণে।

> ছায়ার সৃষ্টিই যেন সমস্ত উৎসকে রুদ্ধ করবার জন্য। আসলে এই রোদ্দুরে ছায়া থাকবার কথা নয়, তথাপি বড় আমগাছটিতে উৎসারিত সূর্যালোক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছায়া বিস্তারে রত। এই নিরালম্ব ছায়ার ভিতর ডুবে যেতে যেতে দেখি— জলাভূমির জলের ভিতর একটি সাপের চলনের রেখার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়ে যাওয়া। এ রেখার চলন সোজা-সরল নয়। জটিল। প্রতিটি বাঁকেই ছড়িয়ে যাচ্ছে গুচ্ছের অন্ধকার। বিশাল এক জলভূমির শূন্যতার ভিতর কেমন যেন ভয় করে উঠল এবং শীত শীত। আমি ফিরতে চাইলে অবিনাশ ডিঙি নৌকার লগিতে ঠেলা দিল—... বহুদূর বিস্তৃত এই জলাভূমির কিনারায় সূর্য ডুবে যাবার আয়োজনের ব্যস্ততায় চতুর্দিকে মায়াবী আলো। সেই আলো জলের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়ে শুশ্রূষার মতন ছড়িয়ে পড়েছে তবুও অবিনাশ বিষণ্ণ। ডিঙি ঘাটে বাঁধা হয়ে গেলে হাত বাড়িয়ে দেয়— প্রসারিত হাতে হাত রাখতেই বুঝি ভীষণ অন্যমনস্ক সে। তন্নতন্ন করে খুঁজেই চলেছে চোখ দলছুট একাকী এক সাইবেরিয়ান ক্রেইনকে। অথচ তার হাতের তালুর নীচেই যেন পাখির উপস্থিতি। এরকম পরিস্থিতিতে চাইছিলাম কিছু আলো এসে পড়ুক তার বিষণ্ণ মুখের উপর। কিন্তু আলো কোথায়? আমার উপস্থিতিই যেন আলোর প্রতিবন্ধক। তবে কি ডুবন্ত সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছি? তখনই চিৎকার করে ওঠে 'ওই যে আসছে...।' প্রসারিত হাত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে অনুসরণ করতেই ডিঙি দুলে ওঠে। ভারসাম্য হারিয়ে দুলতে থাকি। পরে পাড়ে নেমে দেখেছি একটি বিন্দুর ক্রমশ বড় হয়ে এগিয়ে আসা। (দলছুট)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উপান্তে এসে পাঠক গল্পের নিসর্গ ও নিসর্গের বাস্তব নিয়ে একটা ধন্দে পড়ে। দ্বন্দ্ব তৈরি হয়— কী করে গল্পের নিসর্গ হয়ে উঠতে পারে এতটা মায়াবী! এত রোদ্দুর, এত ছায়া; এত আলো, এত অন্ধকার গল্পের শব্দ-শরীর যে কীভাবে ধারণ করতে পারে? এ-বিশ্ব লয়ে খেলিছেন যিনি, মাটি নক্ষত্রের এই অনন্ত চরাচর টলমল ভাসছে যার কল্পনায় একমাত্র তিনিই তো পারেন এত রোদ্দুর-ছায়া, এত আলো-অন্ধকার, নিসর্গের সীমাহীন বিস্তারকে এভাবে থরে-বিথরে সাজিয়ে দিতে। সূর্যাস্তের মায়াবী আলো জলের উপর প্রতিবিম্বিত হয়ে শুশ্রূষার মতন ছড়িয়ে পড়ে— জানতে চাইনা কে উপমেয়, কে উপমান— সব লুপ্ত হোক— আমি একবার মুগ্ধ হতে চাই। একটি বিন্দুর ক্রমশ বড়ো হয়ে এগিয়ে আসা— সিনেমাটোগ্রাফির এই প্রকৃতিপাঠ আমাদেরকেও সংখ্যালঘু করে দেয়, করে তোলে তাঁর পাঠক।

'দলছুট' গল্পের আলো-আঁধারের সঙ্গম, নীরবতার ভাষা 'ঠাকুরমার তালপাখার হাওয়ার ভিতর' গল্পে এসে হয়ে উঠেছে আরও প্রতীকী আরও ব্যঞ্জনাময়।

ঠাকুরমার শেষ বয়সটা কেটেছে নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা শব্দের প্রতীক্ষায়। তবে কি

তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল সেই পূর্বপুরুষের অনুশোচনার বিলাপ শুনতে পারে সে? সময় কাটাত অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থেকে, নিঃশব্দে, ছায়ার মতন। তখন মনে হত যে যেন কোনো এক জলপথের যাত্রী। জলপথের যাত্রীদের মধ্যে অনিবার্যভাবে যা ঘটে থাকে সূর্যাস্তের পর— এক আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে নিকটতম দাঁড়ের শব্দও শোনা যায় না, শুধু শোনা যায় দূরের দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণের মধ্যে নৌকার দাঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জলের ঢেউ-এর অস্ফুটে ছড়িয়ে পড়বার শব্দ। তার ভিতরে যেন নীরবতা ঘনিষ্ট হয়ে থাকত তখন।

'নীরবতা'ও ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়ে উঠছে যেন। শব্দের অনুপস্থিতিকে মেনে নিলে তো আর নীরবতার উপস্থিতিকে স্বীকার করা হয় না। এখানে গল্পকার শব্দ ও নীরবতার শরীরী উপস্থিতিকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলছেন যেন। নদী, আলো, অন্ধকার, শব্দ, নীরবতা, ঠাকুমা, তালপাকা, সাঁকো, নৌকা— বাস্তবে কেউ দ্রৌপদী হতে চায় না, তবু রক্তমাখা পরচুল ('চুল তো নয় রক্তের নদী') পরে, ঘরে মেয়েমানুষ থাকতেও যাত্রার আসরে পুরুষ মানুষের দ্রৌপদী সাজা— এইসব প্রতীকী-দীপন বাস্তব-পরাবাস্তবতার সন্ধিলগ্নকে ফিরিয়ে আনে সগৌরবে।

উদাহরণ সংগ্রহকে সংখ্যাতীত করে তোলা যেতে পারে। পাঠক তা নিজেই পারবেন জানি। আমরা শুধু এখানে দেখাতে চাইছি পীযূষের গদ্যের মধ্যে নিসর্গের ইমেজ, চিত্রকল্প সময়ের সাথে সাথে কীভাবে হয়ে উঠছে আরও প্রতীকী, আরও কাব্যময় :

> জানলার বাইরে আকাশের নক্ষত্ররা আলো গুটিয়ে নেয় এমনই সন্ত্রাস। রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন ছুটে চলে তীব্র গতিতে। অন্ধকারের এ ছোটা যেন রাত্রির বুকের উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে ছুটছে— আর রাস্তাগুলো এক জায়গায় মিশে গেলেই সৃষ্টি হচ্ছে এক শূন্যতার। এসব কিন্তু ঘরের মধ্যে ঘটে চলে— ঘরের মধ্যেই একটা রাত্রির মৃত্যু ঘটে যায়। (চার নম্বর স্বপ্ন অথবা অজানা ফুলের সৌগন্ধ)

স্বপ্ন আর এইসব আলো-অন্ধকার মনস্তাত্ত্বিকের কোনো তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোনো বিদিশার কথা বলে নাকি? কন্নড় লোককথার সূত্র ধরে আনা গল্পটার ডাক্তার, মনোজ শর্মারা তার খবর জানে। আর আমরা জানি স্বপ্নের ওই সব ছায়া-রোদ্দুর, স্বপ্নের ওই সব আলো-অন্ধকার— নখদর্পণে আঁকা নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা— একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়।
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম—

পীযূষের প্রায় সব গল্পেই নদী এসেছে— আশ্চর্য, বিস্ময়কর সব নদী। 'কুশপুত্তলিকা' থেকে 'ঠাকুমার তালপাখা' পর্যন্ত কোন গল্পটায় নদী আসেনি এবং কেন— একটা প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে পীযূষের পাঠকরা তার কাছে কৈফিয়ত চাইতেই পারেন বরং গল্প নয় শুধু, পীযূষের জীবনেরও পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নদীর অনুষঙ্গ। 'একটা মানুষ একটা জীবন কাটাতে পারে তুলসী গাছ নিয়ে, আর আমার তো তিন তিনটে নদী— আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন। আর তিন নদী এক বেণী বেঁধে রূপসী হয়ে গেছে কখন জানি না, তবে মজে আছি।' (ভূমিকার পরিবর্তে' : *নির্বাচিত গল্প*— পীযূষ ভট্টাচার্য) এ জন্যই কী তাঁর গল্পে এত নদী। পশুপ্রতীক, কুলপ্রতীক নিয়ে লিখতে লিখতে নদীকে কবে থেকে যে মানব-প্রতীকে (personify) রচনা করে চলেছেন— পীযূষের পঞ্জিকায় সেই তারিখের হিসেব নেই কোনো।

'ভাসান' গল্পে একটি নদীকে দেখেছিলাম আমরা। 'নদী এখানে পূর্ব দিকে, তাই হাওয়া যখন আসে পূর্বদিক থেকে আসে'। নদীর উপস্থিতি ও আধিপত্য এখানে নিয়ন্ত্রণ করছে সংলগ্ন পরিসরকে। 'মাছ' গল্পে দেখি নিত্য, শচীদের জেলে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত একটি নদীকে। 'নদীর বুক থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস নিত্যকে সম্মোহিত করে। ডাকে। অন্ধকার নদী তখন অনন্যরূপা বইছে।' নিত্য উঠে এসেছিল এই নদীর কাছে। একটি মৃত নদীর গল্প 'দহ'। ছোঁয়া বঁড়শি-র ফাঁদ নিয়ে সারারাত নদীর বুক চোষে ফেলে জগৎ দেখে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে— 'ছোঁয়া বঁড়শি' গল্পের পটভূমি জুড়ে রয়ে গেছে আর একটি নদী। 'অভিশপ্ত দেবদূত' থেকে দেখছি নদী চরিত্র হয়ে উঠতে চাইছে :

> জোয়ারভাটা নেই— জোয়ারভাটার স্পর্শশূন্য নদীর এই তীরে সেই অন্তঃসারশূন্যতা, ফাঁপা নিষ্ফলা শব্দাশব্দির মধ্যে বারে বারে ফিরে আসছে এমনই এক নৈঃশব্দ্য... সে শুধু এতদিন আত্রাই-এর রূপে মুগ্ধ। দৈত্যকে খুঁজেছে— যে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেছিল নদীকে হিমালয় থেকে। নীচু হয়ে নেমে আসা অন্ধকারে কোনো এক অলৌকিক নদীর গতিপথ নিয়ে দৈত্য আর দেবদূতের যুদ্ধের মধ্যে দুরুহ এক দীর্ঘশ্বাস কখন যে জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। (অভিশপ্ত দেবদূত)

নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, কোটালের বন্যা, মাথায় টিকলি, বাজুবন্ধ, কানপাশা, চওড়া গলার হার, হাতভর্তি চুড়ি, কোমর বন্ধনী পরে উলঙ্গ হয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলতে থাকা নীনাবউদি, অশোক, চ্যাটার্জিদের গল্পটা যখন 'শব্দলুপ্তসময়কাল'-এর মধ্যে মুখ গুঁজে দিতে চাইছে— তখন আমরা গল্প কথককে বলতে শুনি :

> নদীর এত কিনারায় দাঁড়াবার প্রয়োজন এতদিন অনুভব করিনি, অশোক চলে যাবার পর এসেছি। কেন এসেছি? নদীকে কি বলতে এসেছি। তোমাকে ছুঁয়ে ফেলা অভিশপ্ত দেবদূত চলে গেল আজ? (অভিশপ্ত দেবদূত)

এভাবেই পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে নদী ব্যক্তিত্ব-আরোপিত হয়ে ওঠে।

'ঠাকুমার তালপাখা'য় এসে পাঠক লক্ষ করেন নদীর প্রতীকী উপস্থিতি। প্রচলিত নদীর

ইমেজকে ভেঙে দিচ্ছেন পীযূষ। 'নদীর পুড়ে যাবার গল্পের শেষ জানা নেই' পীযূষের, যদিও শুরুটা ছিল জানা :

> 'তাকে জলধারার মতন মনে হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে বুঝেছিলাম এ নদী না হয়ে যায় না, কিন্তু কখনও যা ঘটেনি তাই যেন হয়েছে— আগুনে দগ্ধ হয়েছে জল।' তবে কি জল আর আগুন ক্ষমাহীনভাবে স্বভাবশত্রু? এই রকম এক নদীর পুড়ে যাবার কথা গল্প হয়ে উঠছে। (নদী পুড়ে যাচ্ছে)

হারিয়ে যাওয়া নদী, নদীকে ঘিরে রাজনীতি, নদী উদ্ধারের নকশা— তারপর আবার তার ফিরে আসা, চিরমতি হয়ে জেগে ওঠা— নদীনারী বা নারীনদীর এই প্রতীকী উপস্থিতি পাঠককে বিস্মিত করে।

'শূন্য কফিন অথবা মৃতের হাঁটবার গল্পে' চক্রবর্তী স্বপ্নে এক অচেনা নদীকে দেখেছিল। এগারো বারো বছরের সাকিনা কফিন থেকে বেরিয়ে সে নদীতে নাইতে নামলে তখনই নদীর জল হয়ে গিয়েছিল বরফ। বি এস এফ — বি ডি আর হয়ে কফিন যখন সাকিনার বাবা-মার কাছে পৌঁছোয়, ততদিনে 'মেয়েটা গলে জল হয়ে গেছে।' লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া মানুষের তো করার নেই কিছুই। চর্যাগানে নদীর ইমেজ ও শূন্যতত্ত্বের ধারণা যেমন মিলেমিশে থাকে— এখানেও তেমনি নদীর প্রতীকী উপস্থিতির পাশে লীন হয়ে যাওয়া সাকিনার কফিন।

ঠাকুমা, আর তার তালপাখা ও একটি নদীর গল্প নিয়ে 'ঠাকুমার তালপাখার হাওয়ার ভিতর' আখ্যানটি। মানুষ তো নিজস্ব প্রয়োজনে সময়ের ধারণাকে বিভিন্ন ছোটো, বড়ো, মাঝারি খোপে ঠেসে ঠুসে রেখেছে সযত্নে। আখ্যানের শুরুতেই পীযূষ সময়েই সেই ধারণাকে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছেন। টাইমকে অস্বীকার করে স্পেসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন গল্পকার। 'কেউ ভূমিকম্প, কেউ ভীষণ চলোচ্ছ্বাস, কেউ দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ দিয়ে সময়কে বেঁধে ফেলতে চায়। আর এরা বেঁধে ছিল সময়টিকে ঠাকুরদালান থেকে ত্রিনয়নী খাঁড়া চুরি হয়ে যাবার পর থেকে।' আর ঠাকুর মা 'লেসে নকশার জালে নৌকা-সহ নদীকে তালপাখার চতুষ্পার্শ্ব জুড়ে বেঁধে ফেলে ভেবে ছিল — যাক বাঁচা গেল। কেননা সে নদীকে বন্দী করে ফেলেছে এবং নদী সম্পর্কে যাবতীয় আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন।' এখন ত্রিনয়নী খাঁড়ার শূন্যতা ভরাট হয়ে আছে ঠাকুমার ওই তালপাখায়। নদী সাঁতরে এপারে এসেছিলেন ঠাকুমা আর কখনো ওপারে যাননি। কুরুশকাঁটায় লেসের নকশাতে তুলে এনেছিলেন সেই স্মৃতির ছবি— নৌকা ডুবে যাওয়ার করুণ বর্ণনা। নদীর ভাঙা গড়ার সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায় একটি পরিবারের ঠাকুমা-বাবা-ছেলের বংশানুক্রমিক পালাবদলের ইতিবৃত্ত। তবু তো জীবন বহে চলে— নদীর প্রতীকী উপস্থিতি সে জীবনে উঁকি দিয়ে যায় বার বার।

'ভবনদীর ঘাটে' গল্পে তো জাগতিক নদীটা তার সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে প্রতীকী নদীর কোনো এক গোপন টানে। নদীর পটভূমি নয়, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকা নদী নয়, নদীর আধিপত্য নয়, ব্যক্তিত্বে আরোপিত হয়ে ওঠাও নয়— নদী ও প্রতীকী নদীর সম্পর্ককে

এখানে পীযূষ বুঝতে চাইছেন।

এত সব কথা না লিখে যদি বলি, পীযূষের সব গল্পই আসলে— সেই সব নদীর উপাখ্যান, তাহলে খুব কি ভুল বলা হবে? যদি বলি পীযূষ তাঁর সমস্ত আখ্যান জীবন জুড়ে একটি নদীরই আখ্যান লিখে চলেছেন— তাহলে খুব কি অসঙ্গত বলা হবে?

যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার

'সব ভালোবাসা যার বোঝা হল — দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'জীবন' কবিতায় এভাবেই লিখেছিলেন জীবনানন্দ। 'বোঝা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ও প্রয়োগার্থের দ্বিধা পেরিয়ে আপাত নিরীহ অথচ অনিবার্য এক হাইফেনের মুখোমুখি হয়ে পাঠক বুঝতে পারেন পর্ব আর পর্বান্তরের মাঝে রয়ে গেছে ওই মনোরম যতি চিহ্নের নিরলম্ব উপস্থিতি। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে, মাটির গন্ধ আর নক্ষত্রের আলোর মাঝে ওই যতি চিহ্ন ভালোবাসারই দুই ভিন্নরূপকে— হয়তো জীবনানন্দের মতো কবির নিভৃত অভিলাষকে শব্দরূপে সাজিয়ে দেয়। জীবনানন্দই তাই বলতে পারেন পরম বিশ্বাসে : 'মৃত্যুরেও তবে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো!/সব সাধ জেনেছে যে সেও চায় এই নিশ্চয়তা!' প্রেমের রোমান্টিকতার মধ্যে মৃত্যুর ভয়ংকর সুন্দরের এক আশ্চর্য সহাবস্থান দেখেছিলাম জাঁ কক্‌তোর 'অর্ফিয়ুস'-এ। অর্ফিয়ুস সেই মৃত্যুকে ভালোবেসেছিলেন— সেই ভয়ংকর সুন্দরের আকর্ষণ-ই ছিল অর্ফিয়ুসের প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু। মৃত্যুভাবনা নিয়ে অদ্ভুত এক দ্বান্দ্বিকতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' লিখেছিলেন যে কবি *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*-তে *শেষলেখা*-র 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' কবিতায় তিনিই লিখলেন 'যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস/ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।' মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজকবিরাজের জিজ্ঞাসার উত্তরে *ডাকঘর*-এর অমল বলেছিল : 'পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি।' অন্যদিকের অমলের স্রষ্টা ২২ শে শ্রাবণের কাছাকাছি পৌঁছে এনলার্জড প্রস্টেট গ্লান্ডের অপারেশনের কয়েকদিন পরে জ্বর আর যন্ত্রণা যখন বাড়ছে ক্রমশ তখন তিনি বলেছিলেন ক্ষীণ আবছা স্বরে 'কী হবে কিছু বুঝতে পারছি নে— কী হবে।' (*সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ* : অমিতাভ চৌধুরী) এক অর্থে এ কোনো ব্যক্তি দ্বিধা নয়, তেমনি নয় কোনো ব্যক্তিজিজ্ঞাসা। সেই আদি পুরাণ থেকে কবিতা, ধর্মগ্রন্থ থেকে দর্শন, শিল্প-সাহিত্য থেকে ইতিহাসে এভাবেই ছড়িয়ে আছে মানবসত্তার মৃত্যু অভিসারের কথা। মৃত্যুভাবনাকে ঘিরে সত্তার অন্বেষণের কথা। মহত্তম ও সচেতন প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর সৃষ্টিতে মৃত্যুবিষয়ক অন্বেষার ছাপ রেখে যান। পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পে আমরা পাব সে অন্বেষার রূপান্তরিত বীক্ষা।

> পীযূষের বেশ কিছু গল্পে মৃত্যুর অনুষঙ্গ আছে। আছে মৃত্যুকে ঘিরে দার্শনিক জিজ্ঞাসা : মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছে যেন জীবন জীবন হয়ে উঠেছে। মৃত্যুকে তো বোঝা যায় না। মেনে নিতে হয়।

'কোরবানী' গল্পের এই ভাবনা 'তদন্ত সাপেক্ষ একটি কাহিনী'তে দেখি আরও প্রতীতিদীপ্ত হয়ে উঠতে :

বেঁচে থাকার সাথে সাথে যেমন মৃত্যুও ঘোরে— তাই মৃত্যুকে আহ্বান করার দরকার হয় না যদি বোঝা যায়, সে তো প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে আছেই।

'কোরবানী' গল্পে বাচ্চুমিয়া আর 'তদন্ত সাপেক্ষ একটি কাহিনী' গল্পের সোমনাথের মৃত্যুভাবনাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে পীযূষের মৃত্যুজিজ্ঞাসা। মৃত্যুকে যেভাবে দেখা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে— ইতিহাসের ক্রান্তিকাল পেরিয়ে ধর্মান্তরিত বাচ্চুমিয়ারা সেই প্রতীতি, সেই সংস্কার, সেই সব ট্যাবু পেরিয়ে যেন নতুনতর মৃত্যুদর্শনে স্থিতি খুঁজতে চাইছেন। রমগুল ধরে হাওড়া, হাওড়া থেকে মালদা, মালদা থেকে টানা আশি কিলোমিটার ট্যাক্সিতে অসুস্থ কামালকে নিয়ে ফিরছিল বাচ্চুমিয়া। ঠিক তার দিন দুয়েক আগে বৃষ্টি না হওয়া ঝড়ো দিনে কারা যেন এক আদিবাসী রমণীকে তুলে নিয়ে গেছে।

যদি প্রশ্ন করা হয় কোন দিকে? এখানকার মানুষ কোনোরকম চিন্তা না করেই বাদশাহী আমলের রাস্তার ধারের গ্রামগুলোর দিকে আঙুল তুলবে। নবদ্বীপ জয়ের পর বক্তিয়ার দেবকোট গঙ্গারামপুরের রাস্তা দিয়ে তিব্বত জয় করতে গিয়েছিল। সেই রাস্তার দু'ধারের গুটিকয় গ্রামের দিকে আঙুল তোলা যেন নিয়ম। এত শুনশান কেন? ডিগ্ ডিগ্ করে গভীর নলকূপ চলার আওয়াজও বন্ধ। সমস্ত পথ জুড়ে বক্তিয়ার দশ হাজার সৈন্যের কুজকাওয়াজ ত্রিতালে ছোটো ঘোড়ার খুরের শব্দ তো কবেই লুপ্ত। কোথায় এশিয়ার তুর্কিস্থান— কোথায় তিব্বত? মাঝপথে দেবকোট দুর্গ থেকেই গ্রামগুলির পত্তন। তবে কি বাচ্চুমিয়ারা পরাজিত সৈন্যের বংশধর? (কোরবানী)

ইতিহাসের এই প্রদোষকাল পেরিয়ে যে সময় অবস্থানে আজ দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চুমিয়া-কামাল-কুলসুমরা, তাতে ইতিহাস, জীবন ও মৃত্যু ঘিরে ধারণার নতুনতর পরিসর সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বৈকী? পারস্য উপাখ্যানের চেনা উটও যে কখন হয়ে যায় বরেন্দ্রভূমির লোকায়ত জীবনের টোটেম— পীযূষের গল্পের চোরা স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে পাঠক তার হদিস পেয়ে যান সহসা।

হাসপাতালে বাচ্চুমিয়ার স্যালাইনের ড্রিপে অক্সিজেনের বুদবুদে ঘাত প্রতিঘাতে যেন প্রমাণিত হয়েই চলেছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে গোলমাল নেই। মানুষ তো জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ নিয়েই জন্মায়। মানুষ যখন প্রথম হয়ে ওঠে তখন কি সে মৃত্যুকেও আবিষ্কার করেছিল? কেননা মানুষ একসময় মৃতের সঙ্গে অস্ত্র কবরে দিত যেন মৃত্যুর পরও যে জীবন অব্যাহত সেখানেও সে লড়াই করতে পারে। সেই অর্থে কামাল তো নিরস্ত্র। (কোরবানী)

কামালের আরোগ্যের জন্যে আনা কোরবানির উট পার্থিব জীবনের শেষ আবার যখন অনন্ত সময়ের কোনো বাঁকে পুনরুত্থান ঘটবে তখন— কামাল-বাচ্চুমিয়া-কুলসুমকে সে

প্রলয়ের নদী পার করে দেবে। ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দাঁড়িয়েও ভাবনার একটা নতুন কনভেনশন তৈরি করতে চাইছেন পীযূষ। পৌঁছোতে চাইছেন উত্তরে :

> যার আরোগ্যের জন্য এই কোরবানী সেই যখন নেই তখন আর কেউ জানতে চাইনি পবিত্র কোরবানী উটের সম্মতি আছে কিনা? কামালের আততায়ী কে? এ প্রশ্ন করতে একসময় যখন সকলে ভুলে গেল তখন হাসপাতালে বাচ্চুমিয়া প্রথম কথা বলল— 'মিনহা খালাক নাকুম, অর্থাৎ তোমাকে এই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে', 'আফিয়া নুয়ি দোকুম'... এই মাটিতেই তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে। (কোরবানী)

বাচ্চুমিয়ার মতো সোমনাথও পৌঁছেছিল ভিন্নতর এক প্রত্যয়ী বীক্ষায়। বাস অ্যাক্সিডেন্টের পর মৃত্যুর গ্রাম থেকে জীবনের পথে ফিরেও জাগতিক নব আনন্দে মাতেনি সে। নদীর গা ধরে কুয়াশার ভেতর ঢুকে যেত যেতে বরং আবারও সে ভাবতে চেয়েছিল :

> নির্জনতার খোঁজেই কি সে এত দূর চলে এসেছে। যেভাবে বন্য হাতিরা চলে যায় অরণ্যের নির্জনতম স্থানে— মৃত্যুর আগে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত যে সময়সীমাকে কোরানে 'ইহলোক' বলা হয়েছে, 'কোরবানী' গল্পে যে সময় পরিসরটি প্রদোষকালের আবর্ত পেরিয়ে নতুন কাল পরিসরে স্থিত। কেয়ামতের কাল বা 'মধ্যলোক'-এ এসে গল্পটি শেষ হয়। কর্মফলের নিরিখে বেহেস্ত বা দোজোখবাসের যে পর্বকে কোরান-হাদিসে 'পরলোক' পর্ব বলা হয়েছে— তার আলোকিত ভুবন এখানে নেই। কেননা নিরস্ত্র কামাল শুয়ে আছে কবরে। শেষ বিচারের পরে কামাল পাপাত্মা না পুণ্যাত্মা গল্পে তা বলা হয়নি কোথাও। বলার যেমন দরকার ছিল না, তেমনি অনিবার্য ছিল না কোনো ফেরেশতার উপস্থিতি। গল্পটা এখান থেকে আরও একবার বাঁক নেয়। অন্যদিকে, 'তদন্ত সাপেক্ষ একটি কাহিনী'-তে দেখি মার্টিন হাইডেগারের সত্তাসমূহের সত্তা-র (Being of Beings) বিস্তার। হাইডেগারের ভাষায় জগৎ-সম্পৃক্ত সত্তা হল Deseir, আর জগৎ সম্পৃক্ত-সত্তা যেহেতু অস্তিত্ববান (Exists) ফলত ওই Deseir নিজস্ব সম্ভাবনাগুলোর প্রতি আত্মনিযুক্ত, যে লক্ষ্যশূন্য নয় বলে নিজের অ-অনুভবীকৃত-সত্তা (Still to be reilised) কে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখে। মৃত্যু এই Deseir-এরই চূড়ান্ত সম্ভাবনা। গল্পে দেখি জগৎ-সম্পৃক্ত-সত্তা চূড়ান্ত সম্ভাবনা থেকে আবার ফিরে এসেছে সার্থক জীবনের দিকে (Authentic life)। সেখান থেকে আবার মৃত্যুর নিবিড়ঘন নির্জনতায় আত্মজ্ঞানের কাছে পৌঁছোতে চাইছে Deseir-এ উত্তরণের জন্য। ফলত সোমনাথ শুধু নয়, গল্পের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে একটা জার্নি— মৃত্যু থেকে নতুনতর জীবন, আবার নতুনতর জীবন থেকে নতুনতর কোনো নির্জনতা, হয়তো মৃত্যুই।

ঠাকুরমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থের 'শূন্য কফিন অথবা মৃতের হাঁটবার গল্প' এবং 'ভবনদীর ঘাটে' গল্প দুটিতে লোকশ্রুতি-র সূত্র ধরে মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে। মৃত্যুভাবনাকে

কেন্দ্র করে গল্পকারের অনুভব (Feeling) পৌঁছোতে চাইছে দার্শনিক জিজ্ঞাসার উপান্তে। স্মৃতি থেকে জীবন আবার জীবন থেকে স্মৃতি, বাস্তব থেকে পরাবাস্তব আবার পরাবাস্তব থেকে বাস্তবের দিকে গল্পের উভবল গতি ও তখন ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। স্মৃতি-জীবন বাস্তব-পরাবাস্তবতার মধ্যে তখন শব্দ-সময়ের স্বতন্ত্র একটি পরিসর তৈরি হয়ে যায়। রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সীমান্ত, কাস্টমস্ অফিস, সীমান্ত চৌকির জোয়ান, দেশভাগের গোপন ক্ষত, স্বপ্নের মুক্তিযুদ্ধ, আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকশ্রুতি, নদীর রূপক-রূপকনদী— এইসব আপাত ছোটো দৃশ্যমান বাইরের বৃত্তগুলি যে আখ্যানবৃত্তের চারিদিকে পুঞ্জিভূত হয়ে নিটোল আখ্যানবৃত্তটি তৈরি করছে— তা আসলে ওই শব্দ-সময়ের স্বতন্ত্র পরিসর। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বুঝে নেওয়া, অথবা জীবন-মৃত্যুর মধ্যে যেন এক পাতানো মিতালির খেলা আছে তার মধ্যে :

> একদিনের জ্বরে সাকিনা হাসপাতালে মারা যাবার পর মৃত সাকিনা হাঁটতে শুরু করে। সাকিনার ফিরে যাবার কাগজ উদ্ধারও হয়ে যায়। এইভাবেই জীবিত মানুষেরা মৃত মানুষের সঙ্গে হাঁটতে চলতে শুরু করে? (শূন্য কফিন অথবা মৃতের হাঁটবার গল্প)

বাংলাদেশের আটপৌরে আরও দশটা মেয়ে যা চায়, সাকিনা তেমনি চেয়েছিল— তার কাছের মানুষকে কাছে পেতে 'আমি সালেমকে ছাড়া বিহা করুম না।' কাঁটাতারের বেড়ার দু-পারের আকাশকে আলাদা করতে পারেনি বলে সীমান্তরক্ষীর হাতে ধরা পড়তে হয় তাকে কিন্তু মৃতের তো সীমান্ত নেই কোনো।

> মৃতদেহ হাঁটতে হাঁটতে এপারে অথবা ওপারের মানুষের মধ্যে মিশে যেতে পারে— ... ... চারজন বি এস এফ জোয়ান কফিন তুলতেই বোঝে শূন্য কফিনে, বি ডি আর-এর জোয়ানরা বোঝে তা। শূন্য কফিন হাত বদল হয়ে প্রোটোকল শেষ হয়ে শূন্যতা নেমে আসে। হয়তো শূন্য কফিন হাতবদল হতে হতে চলে যাবে সাকিনার বাবা মায়ের কাছে। তাদের বোঝানো হবে কবরে তো সাকিনার দেহ লীন হয়ে যেতই, সেভাবে কফিনের ভেতর তোমাদের মেয়ে লীন হয়ে গেছে। লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া মানুষের যেন কিছুই করার নেই। (শূন্য কফিন অথবা মৃতের হাঁটবার গল্প)

'কোরবানী' গল্পের শেষেও আমরা দেখেছিলাম 'আফিয়া নুয়ি দোকুম'— মাটিতেই তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে। পুনর্জন্মের ধারণা আমাদের ভারতীয় পুরাণ উপনিষদের সমর্থনপুষ্ট। সেখানে চার্বাকপন্থীরাই যুক্তিবলে সাহসী হয়ে পুনর্জন্মের ধারণাকে অস্বীকার করে ঘোষণা করেছিলেন 'মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই'। বলেছিলেন, 'মৃত্যুই অপবর্গ' (মুক্তি)। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (কঠোপনিষদ্) ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের 'যদিদং সবং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাহভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যতে ইতি...' থেকে সরে এসে চার্বাকপন্থীরা যে বস্তুবাদী দর্শনে স্থিত হয়েছিলেন— পীযূষ ভট্টাচার্যের মৃত্যুভাবনা 'কোরবানী' গল্পে সেভাবে জিজ্ঞাসার উপান্তে পৌঁছোতে চাইছে। যদিও ওই বিশেষ

দার্শনিক বীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে দেখি বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বের ধারণাকে।

'শূন্য কফিন ও মৃতের হাঁটবার গল্প'-এ শূন্যতার ব্যাপ্তি থেকে আমরা যদি 'ভবনদীর ঘাটে' গল্পের মুখোমুখি হই, তাহলে দেখি :

> শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে যাবার পর বোঝা গেল যে, কতদূর অবধি শূন্যতার বিস্তার ঘটতে পারে রক্তে। ... কেননা শূন্যতাও একসময় থিতু হতে চায় — আর থিতু হতে চাওয়ার মধ্যেই হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। (ভবনদীর ঘাটে)

গল্পে একজন মুণ্ডুহীন মানুষকে পাঠকরা পেয়েছেন— যে দাঁড়িয়ে ছিল মৃত এক নদীর চড়ার বিপজ্জনক অংশে — পাতালের এক গোপন নদীর টানে নদী যেখানে তার সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে। বিপদ বোঝবার জন্য চরের মধ্যে সেখানে একটা নিশান পোতা।

> মানুষের বাহুর অস্থি এঁকে তার উপর মৃত মানুষের করোটি এমনভাবে আঁকা— দেখে যেন মনে হতেই পারে সবকিছুই শূন্যের উপর ঝুলছে। (ভবনদীর ঘাটে)

গল্পটা এখান থেকে পীযূষের সময়-সমকাল, রাষ্ট্র-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বিনোদ-প্রধান-হুজুর-কাঞ্চনমালাদের পৃথিবী থেকে গল্পটা আবার কখন যেন চলে যায় ওই শূন্যতার বৃত্তে। রিয়্যালিটি ও নন-রিয়্যালিটির একটা চাপানউতোর চলে সারাক্ষণ। শাসকের স্বর তখন ভাষা পেতে চায়— 'পুরোটাই চক্রান্ত'। গল্পের শেষ শব্দবন্ধ দুটিতে প্রখর ভাবে পীযূষ গল্পটিকে আবারও রিয়্যালিটির মধ্যে টেনে আনেন— যদিও রিয়্যালিটি ও নন-রিয়্যালিটির মধ্যে তা আসলে পীযূষেরই শব্দ-সময়।

এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা যাক পীযূষ ভট্টাচার্যেরই একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে। 'আপনার মৃত্যুচেতনা— আপনার লেখাতে কীভাবে থাকে?' *গল্পবিশ্ব* পত্রিকার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পীযূষ জানিয়েছেন : 'মৃত্যু নিয়ে মরবিডিতে আমার বিশ্বাস নেই প্রথমেই বলে রাখছি। ষাট বছর বয়স হয়ে গেল এখন যে কটা দিন আছি Extension-এ আছি। তাই মৃত্যু কিছুটা প্রশান্তির রূপ নিয়ে ধরা দিচ্ছে। অনেকটা হাতিদের মতন। নির্দিষ্ট হাতিটি যখন বুঝে যায় সময় এসে গেছে প্রথমে সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন স্থানে চলে যায়, তারপর ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ে। একে তুমি ব্যক্তিগত মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা বলতে পারো।' (কথাবার্তায় পীযূষ ভট্টাচার্য : *গল্পবিশ্ব*, সম্পাদক : অলোক গোস্বামী, পঞ্চম সংখ্যা, ২০০৭) পীযূষের গল্পে আছে এই ব্যক্তিগত দার্শনিক বীক্ষার শিল্পীত রূপ।

পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা

ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যান্য গল্প (২০০৬) থেকে পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্প আবার নতুন করে বাঁক নিল। *শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ* (২০০৯) পর্যন্ত এই পর্বে পীযূষ ভারতীয় লোককথা, বিভিন্ন জনজাতির লোক-ইতিহাস ও লোকশ্রুতির মধ্যে থেকে খুঁজে

নিতে চাইছেন তাঁর গল্পের উৎস-সূত্র। বিভিন্ন জনজাতি, ভিন্ন দ্রাঘিমা-অক্ষাংশে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর কুলপ্রতীক, পশুপ্রতীক বা টোটেমগুলিকে পীযূষ যেভাবে তাঁর গল্পে ব্যবহার করেছেন, ভেঙে কোথাও বা নির্মাণ করেছেন নব-টোটেম— তা দীক্ষিত পাঠককে শিহরিত করে বৈকী।

> মোমবাতির শিখাটি লাফিয়ে জ্বলে উঠবার ফলে মনে হল অন্ধকারকে সম্ভোগ করবার জন্য প্রস্তুত তা। ... এমনই অন্ধকার যে সূর্যের মুখ কোনোদিন দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। মোমবাতি জ্বলে উঠতেই সুহাস ও দেবরঞ্জনের ছায়া মিলেজুলে দেয়ালে একটা ষাঁড়ের আদল পেয়ে যায়। তা যেন কোনো একদিন অন্ধকার গুহার ভিতর আঁকা হয়েছিল। তার স্রষ্টাই বা কে? পুরুষ না নারী? চকমকির মিটমিটে আলোতে আঁকতে বসে কোন বার্তা পৌঁছে দিত দেবতার কাছে পশুর মাধ্যমে? (স্বপ্নের বাস্তবতা)

যদিও আলো-ছায়া, জীবন-মৃত্যু, শরীর-সম্পর্ক, তাস-জুয়া নিয়ে গল্পটি বাস্তবতা থেকে শেষ পর্যন্ত পরা-বাস্তবতার দিকে উড়াল দেয় — তবুও গল্পের সূচনায় সেই নাম না-জানা আদিম রূপদক্ষের আঁকা টোরেস (বাইসন, ষাঁড়)-এর অনুষঙ্গ আসলে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে ঘটমান বর্তমানের মানব ইতিহাসের টোটেম নির্ভরতা ও লোক-ইতিহাসকে আরও একবার সামনে নিয়ে আসে। বিভিন্ন প্রাণী বা পশুর সঙ্গে সামাজিক পুঞ্জের প্রতীকমূলক সম্বন্ধকে র‍্যাডক্লিফ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, ম্যালিনাওস্কি তাকে বুঝতে চেয়েছেন ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে। লেভিস্ট্রস প্রাণী মানুষের সম্পর্ক হিসেবে না দেখে— টোটেমের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক দলের সংসর্গের আধার হিসেবে তাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সেখান থেকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে টোটেমের সঙ্গে ধর্মের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা বলেছেন ফ্রয়েড।

নয়-দশ বছর বয়সে রংপুরে শোনা একটি অসমীয়া লোকশ্রুতির মধ্যে লুকিয়ে আছে 'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ' গল্পটির উৎস সূত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি মন্ত্রনির্ভর কিশোরীমোহন-সবিতারানিদের যাপিত-জীবন, চরকা রাজনীতির পাশাপাশি মনসা মিথ— এসব কিছুর মধ্য থেকে প্রাগৈতিহাসিক আদিমতা নিয়ে মাদি মহিষটা চলে আসে উপনিষদের ভারতবর্ষে। ঔপনিবেশিক শাসকের স্বরকে পরাভূত করে জেগে ওঠে টোটেমের স্বর। সেই-ই হয়ে ওঠে কিশোরীমোহন-সবিতারানি, সোমনাথ-নয়নতারাদের জীবন-নিয়ন্তা। অদৃশ্য মাদি মহিষটা কিশোরীমোহনকে আজও তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়িত করছে সমকাল ও কিশোরীমোহনের বংশধরদেরকেও :

> কিছু বলে উঠবার আগেই যেন মনে হল আমাদের মধ্যে ছুটে-চলা মাদি মোষ আছে, যা আমাদের দু-জনকেই পরাধীন করে রেখেছে। কেননা, আমরা দু-জনই একই রকম ভাবনার দ্বারা তাড়িত। কামার্ত মাদি মোষটা কিশোরীমোহনের নাগাল না পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে এখন। তখন আমাকে জানাতেই হয়েছিল সেই মাদি মোষের ব্যর্থতার গর্জন আমাকে সবসময়ই ঘিরে থাকে। ... দেশ যে আর পরাধীন নেই এ কথা তার জানা নেই

বলে তাকে তো ছুটতেই হচ্ছে সব সময়ই মন্ত্রপূত মাদি মোষের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। মাদি মোষ তাকে কি পরাধীন করে রেখেছে। এ রকমভাবে ছোটা থেকে কি মুক্তি নেই? এসব প্রশ্নের পর যে প্রশ্নটা জাঁকিয়ে বসে তা হচ্ছে— আমরা কি সবসময় কোনো-না-কোনো কিছুর কাছে পরাধীন?

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ)

অসমীয়া লোকশ্রুতির সঙ্গে টাঁড়বাংলার ব্যাফেলো-টোটেমকে প্রাচীন কথকের মুনশিয়ানায় সমীকৃত করে, পীযূষ আবার তাকে ভেঙেছেন। বাস্তব থেকে বিভ্রম আবার বিভ্রম থেকে বাস্তবে— গল্পের সূত্রে পাঠক নিয়ে তিনি খেলছেন। সেই ক্যাথারসিস থেকে বেরোলেই মেধাবী পাঠক বুঝতে পারেন গল্প নয়,— পীযূষ আসলে তৈরি করতে চাইছেন শাসক-শোষিতের একটি ডিসকোর্স।

প্রশ্নের পর প্রশ্নে ডুবে থাকত সোমনাথ, কী বুঝে ছিল কে জানে, তবে নয়নতারাকে মাত্তর দুটো দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল বৈধব্যে পৌঁছোতে। নয়নতারাকে স্বাধীন করবার জন্য হরকী-পেইরির মোক্ষঘাট নয়, একেবারে মানুষের সৃষ্টি জলাধার বেছে নিয়েছিল। কয়েক মাইল ব্যবধানে বহে যাওয়া পাশাপাশি দুটো নদীকে মানুষই প্রথমে খাল কেটে সংযোগ করেছিল যেন এ নদীর জলে পা ডুবিয়ে থাকলে ও নদীর স্পন্দন পাওয়া যায়। ... এখন অবশ্য বদ্ধ জলাশয় তবে যে-কোনো একটি নদীর জল বাড়লেই এই দহতে জলোচ্ছ্বাস। এরও একটা ইতিহাস আছে, আছে পরাজিত মানুষের কথা, পরাজিতরাই এই জলধারার নতুন এই পথ তৈরি করে গিয়েছিল মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুই তাদের পরাজয়ের গ্লানি থেকে একমাত্র মুক্তি দিয়ে যেতে পারত। তাই হয়তো স্থানীয় নাম 'ইছামতী'।

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ)

ঔপনিবেশিক শাসক-শোষিতের দ্বন্দ্ব থেকে গল্পটা ঢুকে যায় উত্তর-ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে। পরাজিতদের তো ইতিহাস নেই কোনো— অথবা এমনই ইতিহাস। বাজপেয়ী সরকারের নদী সংযোগ প্রকল্প খুলে দেয়নি নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার, আমাদেরও হৃদি যায়নি ভেসে কোনো অলকানন্দায়। তবু তো নদীকে হত্যা করেছি আমরা— রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে নদীর স্বাভাবিক খাত, চলমান স্রোতধারাকে ধ্বংস করেছি। আজ নদী নিচ্ছে তার প্রতিশোধ। ক্ষমতার উলটো পিঠে লেখা হচ্ছে পরাজিতদের ইতিহাস। ছুটে চলা মাদি মোষটা তখনও তার গর্জন থামায়নি।

'রিসার্চের বিষয় পাল্টে যাচ্ছে' গল্পেও দেখি লোকশ্রুতির সূত্র ধরে এসেছে ঘোড়া ও কুকুরের প্রসঙ্গ। পশুপ্রতীক হয়তো হয়ে ওঠেনি— কিন্তু ঘোড়া ও কুকুরের প্রতীকী উপস্থিতি পীযূষের শিল্পী-ব্যক্তিত্বে হয়ে ওঠে ইসমাইল-মকবুলদের জীবনের নব-টোটেম। কম সংখ্যক হলেও তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের গাজিতে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাসটা কল্পনাতীত নয়। গল্পে ইতিহাস সমর্থন খুঁজছে লোকশ্রুতির মধ্যে। হুসেন শাহর বিদ্রোহী সেনাপতি ইসমাইল গাজি— শিরোচ্ছেদ

হওয়ার সত্ত্বেও যার ঘোড়া তার দেহ নিয়ে চলে এসেছিল গৌড়ে। তার ছিন্ন মাথাটি উড়ে উড়ে এসেছিল পথ বাতলে দিতে দিতে। হিন্দু ব্রাহ্মণরা তখন ছিলেন নদীতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ পরবর্তী স্নাতরত। তখন সেই নদীর জলে এসে পড়ে ইসমাইল গাজির রক্ত। মুহূর্তে রক্তবর্ণ হয়ে যায় সমস্ত নদী। সেই নদী থেকে মকবুলের পূর্বপুরুষ আজহার গাজি উঠে এসেছিলেন। কোরান শরিফে হজরত মহম্মদের অলৌকিক ভ্রমণে আমরা মিরাজের ঘোড়াকে পাই। বিভিন্ন পারস্য উপাখ্যানে ঘোড়াকে বিশেষ আর্কেটাইপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই গল্পের শুরুতে দেখি একটা কুকুরকে— যে কুকুরটা মকবুল গাজিকে কামড়ে ছিল। গল্পের শেষে দেখি মকবুলের মায়ের ঘরের খোলা দরজায় সেই কুকুরটাই পাহারারত। ইসলামি সংস্কারের সঙ্গে গল্পকার এখানেও আশ্চর্য কৌশলে মিলিয়ে দিয়েছেন হিন্দু পুরাণের কুকুর বিষয়ক আর্কেটাইপকে।

'মধুবনী' গল্পে এই টোটেমকে আমরা পাই হানিমুনে বেড়াতে গিয়ে নানান ঝক্কির মধ্যে হাতে এঁকে নেওয়া অর্ণবের উলকির মধ্যে। উলকির নকশার মধ্যবিন্দুতে ছিল গাছের সংকেত— তাকে ঘিরে আছে নানান ধরনের জলজ ফুল, মাছ, কচ্ছপ। তারও বাইরে ঢেউ। লেখক জানাচ্ছেন, 'স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফুলটিই জলপুষ্প— পদ্ম, যা সূর্য অথবা সৃষ্টির প্রতীক।' সৃষ্টির উৎস, ইকোলজির সমবায়ী স্বরতন্ত্র যে বেলা-অবেলা-কালবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের চেতনায় আজও মধুবনী নকশা হয়ে আছে, যে নকশা জড়িয়ে আছে অর্ণব-ইতুদের জীবনের পরতে পরতে, পীযূষ তাকে ধরতে চাইতেন— কমলকুমার মজুমদার যেভাবে এঁকে ছিলেন 'বাংলার মনোলোক', তেমনি পীযূষও গল্পে যেন আঁকতে চাইছেন সিভিলাইজেশনের সেই প্রাচীনতম ছবি। এখান থেকে পীযূষ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোন 'উল্কি হচ্ছে সিভিলাইজেশনের প্রাচীনতম ইঙ্গিতবাহী অঙ্কন পদ্ধতি।' উত্তর-আধুনিক এই ট্যাটুর মধ্যে রয়ে গেছে টোটেমেরই ঐতিহ্য ও অনুসৃতি।

নাইখন্ রাকাব্ রে দ বাবু / মেঁৎ দাঃ বাবু জরয় মে
তায়ম সেৎ দ আল বাবুম / কয় গ রুও য়াঁড়া

(ভাণ্ডান বিনতি : ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, জীতেন্দ্রনাথ মান্ডি সম্পাদিত)

— আমরা নিরামিষাশী।

মকবুল গাজির মুখে কথাটা শুনেই টাল খেয়ে যায় নিশীথের এতদিনকার বিশ্বাস। মুসলিম মানেই উগ্র পেঁয়াজ রসুনের মাংসাশী গন্ধ উঠে আসত এতদিন তার উপর সেই স্মৃতি যে এখনও অমলিন। খৈমুদ্দিনকে গোমাংস দিয়ে ভাত খাবার দৃশ্যটি দেখেছিল বলেই ইন্ডিয়া থেকে বোতলে করে আনা গঙ্গাজলে চোখদুটিকে ধুইয়ে শুদ্ধ করেছিল তার মা। সেই জল যে কবে আনা হয়েছিল তার কোনো হদিশই নেই। তবে, শোনা যায় তার বাল্যবিধবা পিসিমা আনিয়েছিলেন তার মৃত্যুর সময় এক গণ্ডুষ গঙ্গাজলে শরীরের সমস্ত পাপ ধুয়েমুছে স্বর্গে যাবেন বলে।

(রিসার্চের বিষয় পাল্টে যাচ্ছে)

সকল গোষ্ঠীর মানুষের, সকল জনজাতির সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের, সকল সমাজেরই নিজস্ব সামাজিক সংস্কারের কাছে স্থিতধী। তাতে অবশ্য টাল খেয়ে যায় নিশীথদের সাবেকী বিশ্বাস। আবার নিশীথদের সমাজের নিজস্ব সাবেকী সংস্কারগুলো যে নিজস্ব সমাজ পরিসরের মধ্যে নিরলম্ব দাঁড়িয়ে আছে এমনটি নয়। দাঁড়িয়ে আছে বিবাদী পক্ষের ট্যাবুর প্রতিদ্রোহী হয়ে। আবার কখনো বা ট্যাবুগুলো থাকে পরাঙ্মুখ সহাবস্থানে। নিশীথের বাল্যবিধবা পিসিমার মনে হয়েছিল— তার ভাইরা পাকিস্তানের ভিটে মাটি ছেড়ে যাচ্ছে না বলে বিধর্মীদের দেশে তাকেও থাকতে হচ্ছে— এখানে হিন্দুর আত্মার মুক্তি নেই। এই ট্যাবু তো বিধবা পিসিমাদের নয় কেবল— এ সংস্কার একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ সমাজের সংস্কার— যা গড়ে উঠেছে নিকটতম শক্তিশালী বিবাদী পক্ষের স্বার্থের বিপ্রতীপে। অন্যদিকে 'আপনারা কোরবানি দেন?' নিশীথের জিজ্ঞাসার উত্তরে মকবুল গাজি যখন জানান 'দিই, তবে কোনো পশুটশু নয়, চালকুমড়ো জবাই করি।' তখন নিশীথেরও মনে পড়ে যায় দেশের বাড়ির পুজোর কথা— যেখানে পশুবলি না দিয়ে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হত। 'জবাই' আর 'বলি'-র এই পার্থক্যটুকু ছাড়া নিশীথ ও ধর্মান্তরিত মকবুল গাজিদের ট্যাবুর মধ্যে ব্যবধান নেই কোনো। গল্পের শেষে আছে সেই পরাঙ্মুখ সহাবস্থানের কথা :

— আপনাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই আপনারা নিরামিষাশী?

— হয়তো তাই। সব পরিবারের নিজস্ব কিছু বিধান থাকে, খোঁজ নিয়ে দেখবেন আপনাদেরও আছে। আজাহার গাজির বংশধররা দুটি বিধান মানে, নিরামিষ আর নদীতে না নামা।

(রিসার্চের বিষয় পাল্টে যাচ্ছে)

'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাদি মোষ' গল্পে পীযূষ ট্যাবুকে দেখতে চেয়েছেন একটু ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে। ইতিহাসের বিভ্রম থেকে কখনো কখনো লোকশ্রুতি তৈরি হয় — কোনো একটি বিশেষ সমাজের টোটেম-ট্যাবুকে ঘিরে সেই লোকশ্রুতি সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি করে জায়মান হয়ে ওঠে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ধর্ষণের প্রতিশোধ হিসেবে কিশোরীমোহন চেয়েছিল মন্ত্রপূত কলা খাইয়ে কমিশনারের স্ত্রী এমিলি মেমসাহেবকে বিছানায় তুলে আনতে। শিবদয়াল কাহর কাছ থেকে কিশোরীমোহন শিখেছিল এই মন্ত্র। শিখে নিয়েছিল লিঙ্গ উত্থানের মন্ত্রও। সমস্ত গল্পজুড়ে এই সব মন্ত্রকে ঘিরে যে ট্যাবু— সেই ট্যাবুই নিয়ন্ত্রণ করেছে কিশোরীমোহন ও তার গল্পকে।

লোকশ্রুতি থেকে আলাদা করে ট্যাবুকে দেখানো, বা টোটেমের পাশাপাশি বিন্যস্ত ট্যাবুর কথাকে আলাদা করে চিহ্নিত করলে পীযূষের প্রায় অধিকাংশ গল্পই এই তালিকায় এসে যাবে— যেখানে কম বেশি ট্যাবুর ব্যবহার হয়েছে। 'দণ্ড কলসের ফুল' গল্পটির কথা মনে পড়ছে। গল্পটা বিমল-চিনুদের মধ্যবিত্ত জীবন, সেই জীবনের অসহায়তা ও পাপবোধের গল্প হয়েও, সাপের বিষের প্রতিষেধক অ্যান্টিভেনামের বিপরীতে দণ্ড কলসের পাতা ও শেকড় বেটে খাইয়ে সাপে কাটা রোগীকে সারিয়ে তোলে পিসিমা। অথচ আট বছরের ছোট্ট বাবুলকে

ভাইপার জাতের সাপের কামড়ে চলে যেতে হয় মৃত্যুর শূন্যতায়। মৃত পুত্রের জন্য মৌন পালনের স্থবিরতায় ডুবে যেতে যেতে একটি মধ্যবিত্ত দ্বিধা, পাপবোধ বিমলবাবুকে আক্রান্ত করে 'আমি কী বাবুলকে খেলাম!' গল্পে এ পাপবোধ যত বদ্ধমূল হয়, ততই আসলে দণ্ড কলসের পাতা ও শেকড়কে ঘিরে একটি মধ্যবিত্ত ট্যাবু ওই বিশেষ সময় অবস্থানে, ওই বিশেষ সমাজের মধ্যে বিস্তার পেয়ে যায়। 'ঠাকুমার তালপাখা' সিরিজের তিনটি গল্পের মধ্যেই আছে ট্যাবুর রূপান্তরিত রূপ ও প্রয়োগের বহুমাত্রিকতা।

চক্রব্যূহের আকাশ

অংগামী নাগা (অসম) লোককথা অবলম্বনে 'চক্রব্যূহের আকাশ' নামে পীযূষ নিকট অতীতে একটা গল্প লিখেছিলেন— গল্পটি সংকলিত হয়েছে তাঁর শেষ গল্প সংকলনে। গল্পের সেই ছোট্ট অসুস্থ টাবু, যে জানে— পাখিরা ডানায় করে আকাশের মেঘ নিয়ে আসে। তখন মেঘে মেঘে ভরে যাচ্ছে ঘর। সমস্ত তারারাই তো থাকে দিনের আলোর গভীরে। রাত্রি হলে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে যখন তখন তারা দেখবে বলে জেদ ধরে বসে থাকে টাবু। বাবা, এই গল্পের কথক তখনও অপেক্ষায় না পাহারায়? একসময় সব কিছু গুলিয়ে যায় তার। তবুও তিনি বসে থাকেন টাবুর তারাদের জন্য। টাবুকে *ডাকঘর*-এর অমলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে খুব লোভ হয়। জীবন-মৃত্যু, সীমা-অসীম, জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বের আলোকে আমরা যে অমলকে বুঝতে চাই, জীবনের উদ্দীপনা দিয়ে 'সহজ' দিয়ে সে যে আগেই সবটা বুঝে নিয়েছে— বুঝে নিয়েছে কেমন করে? মৃত্যু যার শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে, তারপক্ষে কি সম্ভব বোধের ওই পূর্ণতায় পৌঁছোনো? অমলের মৃত্যু আমাদেরকেও পীড়া দেয় অহরহ— অবিশ্বাসী হয়ে তুলছি না এপ্রশ্ন। অমল আর অবিশ্বাসীদের *ডাকঘর* নাটকে স্বতন্ত্র দুটি পরিসর ছিল কিন্তু 'চক্রব্যূহের আকাশ'-এ দেখি টাবু আর তার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন অভিন্ন পরিসরে— একটি বিন্দুতে। দাঁড়িয়ে থাকাটাই অনিবার্য তখন। বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি, রাজনৈতিক হত্যা চারিদিকে মূল্যবোধহীন রাজনীতির বেড়াজাল, আত্মঘাতী সময় আর আমাদেরও মাথার উপরে ব্যাপ্ত চক্রব্যূহের আকাশ— তবু আমরা, আমরা পাঠকেরা বসে আছি পীযূষের নতুন গল্পের জন্যে— হয়তো টাবুর তারাদের জন্যেও। অভিন্ন পরিসরে, এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পীযূষ ও তাঁর পাঠক— দুজনেই যে খুঁজছেন— জীবনের সেই সব নিভৃত কুহক।